International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-I, January 2026, Page No. 1-11
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.01W.174

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে অতিন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও তার দার্শনিক ব্যাখ্যা

ড. টুসি ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, ধ্রুব চাঁদ হালদার কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 16.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

We find supersensory (atindriya) perspective of Bibhutibhusan Bandyopadhyay in many parts of his writings. Perhaps his sixth sense was very active which was evident in his own life too.
In this context, we must refer to his novel Dristipradip where in the character named Jitu, we find this kind of perspective. In case of Pather Panchali and Aparajita, we also find that Apu could visualize the unseen through his farsightedness. In his short story entitled Mukti and novel Bipiner Sansar we witness this kind of perspective. Now a question can arise is it possible to see the unseen with supersensory perspective or can the sixth sense be so active to witness what is yet to happen? If it is possible, how can it be explained philosophically? In search of this answer, the author discussed from different systems of Indian Philosophy. Even Batrihari's Pratibha jnana has been discussed in this context. Apart from this, it has also been discussed that Bubhuti bhusan's this type of Supersensory (atindriya) perspective is also found in Tomas Hardy's novel 'Tess of The D'urbervills'.

Keywords: Bibhutibhusan Bandyopadhyay, Supersensory perspective, Tomas Hardy, Indian Philosophy, pratibha jnana

মহান সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট রচনাবলীর বেশ কিছু স্থান আমার কাছে স্বতন্ত্র বলে পরিগণিত হয়েছে, নিজস্ব বিশ্বাসের মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানবজীবন ও প্রকৃতি জীবনের পরিবর্তনশীল প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর রচনার বহু স্থানেই লক্ষ্য করা যায় আগে থেকেই মনে ভাবী ঘটনার ছায়াপাতের কথা বলা হয়েছে। স্বভাবতই মনে হয় এই জাতীয় কাহিনি রচনার প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন বিভূতিভূষণ তাঁকে বলতেন যে Dean Inge–র লেখা পড়ে তিনি মূলতঃ 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর মতো উপন্যাস রচনা করার প্রেরণা পান। তাঁর একথার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে যে তা বোঝা যায় তাঁর লেখা দিনলিপি 'তৃণাঙ্কুর' পাঠ করলে। সেখানে বিভূতিভূষণ লিখছেন,

> "Dean Inge যাকে Joy of life বলেছেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি।... একে সকলে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না।... শিমূল গাছের মাথাটার উপরকার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই রক্ত মেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্বত শিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে তার ওপারে যেন জীবনপারের বেলাভূমি আনন্দ আবছায়ার মত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার একটু একটু চোখে পড়ে।"[১]

তবে তিনি নিজেও আধ্যাত্ম পথের পথিক ছিলেন। তিনি ঈশ্বর, আত্মিক জগত, পুনর্জন্ম ইত্যাদিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রচিত দিনলিপিগুলি পাঠ করলে তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। তিনি এইসময় প্রেততত্ত্ব ও অলৌকিক বিষয় নিয়েও প্রচুর অধ্যয়ন ও তর্ক-বিতর্ক করেছেন।

তাঁর রচনার মধ্যে তিনি একাধিক স্থানে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির উল্লেখ করেছেন। যেমন 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে দেখা যায় ছোট কাকিমার মেয়ে পানীর মৃত্যুশয্যায় জিতু পানীর দিদিমাকে দেখতে পেয়েছিল। পানীর দিদিমা পরলোক হতে পানীকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসেও দেখা যায় অপুর দৃষ্টি মাঝে মাঝে সব ছাড়িয়ে কোন সুদূর অজানা জায়গায় চলে যেত। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই ধরনের অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ভাবনা বিভূতিভূষণ কোথায় পেলেন? শোনা যায়, তাঁর দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, যাকে তিনি তাঁর রচনার উপজীব্য করে তুলেছিলেন। এছাড়াও এই ধরনের ঘটনা বিভূতিভূষণের নিজের জীবনেও বহুবার ঘটেছিল। বাল্যকালে তাঁর চোখের সামনে নানা দৃশ্য হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। একবার তিনি দেখেছিলেন তিনি অনেক লোকজনের মধ্যে বসে আছেন, তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি কি বলেছেন এবং তা শুনে সব লোক হাততালি দিচ্ছে। সিলিং হতে কিছু একটা ঘুরছে। পরবর্তীকালে ঠিক অনুরূপ ঘটনা তাঁর জীবনে আসে এবং বাল্যের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। অর্থাৎ দীর্ঘকাল আগে যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির পরিচয় তাঁর হয়েছিল তারই সত্যতার প্রকাশ ঘটে। আবার তাঁর ভগ্নীপতি হাসপাতালে মৃত্যুর পূর্বেই অনেক আত্মীয়স্বজনদের দেখতে পান। এরকম এক কাহিনি তাঁর রচিত 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসটিতেও দেখতে পাওয়া যায়। 'উপল-ব্যথিত গতি' নামক বিভূতিভূষণের স্মৃতিচারণামূলক রচনায় তাঁর ভ্রাতৃজায়া যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে— বিভূতিভূষণ যখন বনগাঁ স্কুলে চাকরি করতেন তখন মুড়ি-মুড়কি খেতে খেতে ফিরতেন, এক একদিন সাঁকোর ওপর বসে থাকতেন। তখন তাঁর আবেশ আসত, তিনি মোহাবিষ্টের মতন অনেক কিছু দেখতে পেতেন। অবশ্য শোনা যেত ছোটবেলায় প্রায়ই এরকম ভাবনা হত। তাঁর মাও এতে চিন্তা করতেন, কিছু রোগ হয়েছে বলে মনে করতেন। শোনা যায় জাহ্নবী দেবীর স্বামী যখন কলকাতার হাসপাতালে মারা যান তখন বিভূতিভূষণ তাঁর মৃতদেহের পাশে বসেছিলেন। বসে বসে নানা চিন্তা করছিলেন, বেদনাতুর ছোট বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নীরা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তিনি ভাবছিলেন কীভাবে প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ জানাবেন? এমন সময় তিনি কেমন যেন হয়ে যান। হঠাৎ দেখলেন হাসপাতাল স্বর্গে পরিণত হয়েছে। এইভাবেই তাঁর নিজের জীবনে বার বার যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলে তাই তিনি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই বলা যায় তাঁর নিজের জীবনের এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাই বোধহয় তিনি রচনা কার্যের পটভূমিরূপে কাজে লাগিয়েছিলেন।

তিনি 'স্মৃতির রেখা' নামক দিনলিপিতে ৬ জানুয়ারি, ১৯২৮-এ লিখেছেন, "গঙ্গার ধারে গেলাম।... হঠাৎ মনে হোল হাজার দু হাজার বছরকার আগেকার জীবনযাত্রা আবার যেন চোখে পড়ে।"[২] আবার ২১ জানুয়ারি লিখেছেন, "যদি আসতেই হয় তবে হাজার বছর পরে...।"[৩] আবার ১ মার্চ, ১৯২৮-এ লিখেছেন, "যে যাই ভাবুক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি... যেন দেখতে পাই হাজার হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব আনন্দভরা ভিটার মত আর কোন দেশে জন্মে অপূর্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন করব...।"[৪] আবার ১৫ মার্চ ১৯২৮-এ লিখেছেন দেবতার ব্যথায় (বর্তমানে 'দেবযান') এরকম লিখতে হবে যে, কোন উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম শূন্য বেয়ে, অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা...।"[৫] এই ভাবে দেখা যায় তিনি মাঝে মাঝে যেন বহুদূরের বিষয়ও দেখতে পেতেন। তাঁর নিজেরই দৃষ্টিশক্তি মাঝে মাঝে ভিন্ন রকমের হয়ে যেত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নবাগত' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত চতুর্থ গল্প 'মুক্তি' নামক গল্পটি নিস্তারিনী নামক এক যুগী বৌকে নিয়ে রচনা করেছেন। নিস্তারিনী খুব সুন্দরী। সে হরিনাথ বা হরে যুগীর বৌ। সবাই তার রূপের তুলনা করত। যতদিন ক্ষমতা ছিল সে তার সংসারে প্রচুর কাজ করত, সে পরোপকারীও ছিল। গ্রামের যে যখনই তার কাছে কিছু চেয়েছে সে তার শাশুড়িকে লুকিয়ে তাকে সাহায্য করেছে। তবে পঁয়ত্রিশ বছর পরে তাদের সংসারের সাবেক অবস্থা পড়ে গিয়েছে, হরিযুগীও মারা গিয়েছে, আবার তার ছেলে সাধনও মারা গিয়েছে। তাদের গোয়ালভরা গরু ও গোলাভরা ধানও আর নেই, ঘরের চালে খড়ও নেই। কষ্টে সৃষ্টে তাদের চলে। নিস্তারিনীর প্রতি কারো কোন আদরও আর নেই। তাকে হয়ত সবাই ডাকে পিন্টুর ঠাকুমা। নিস্তারিনী সর্বদা জ্বরে ভোগে। সে কিছু খেতে চাইলে কেউ দিতে চায় না। তার ছেলের বৌ, শাশুড়ি, নাতি কেউই তার কাছে আসতে চায় না। একমাত্র তার ছোট জা নির্ম্মলা সারাদিন কাজ শেষে তার কাছে আসে। তার সঙ্গে একটু কথা বলে, একটু খেতে দেয়। আস্তে আস্তে নিস্তারিনী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল, পেট ফুলে উঠল। বেশ কিছুদিন খুব কষ্ট পেল। তার ছেলের বৌ দেখল সে দুপুরে খেতে পারেনি। তাই হাতে করে খাইয়েও দিল। কিন্তু নির্ম্মলা বাড়ি ফিরে বুঝল নিস্তারিনীর অবস্থা ভাল নয়। পরের দিন দুপুর থেকে নিস্তারিনীর অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকল। এইস্থানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "সে অসুখের ঘোরে কোন্ বিস্মৃতপথ বেয়ে ফিরে গেল তার যৌবনদিনের দেশে।... তার মনে হল যেসব লোক কত কাল আগে চলে গিয়েচে, তারা যেন এসে দিনরাত ওর বিছানার চারিপাশে ওকে ঘিরে ভিড় করচে।... ওর সব দুঃখ, সব অপমান, অনাদরের দিনের হঠাৎ আজ এমন অপ্রত্যাশিত অবসান হল কিভাবে? অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারেনা কোন্টা স্বপ্ন — কোন্টা সত্য।..."[৬]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার অন্য স্থানেও দেখা যায় মৃত্যু উপস্থিত হলে তার পূর্ব মুহূর্তে মৃত আত্মীয়স্বজন এসে শয্যার চারিপাশে উপস্থিত হয়। তার সঙ্গে কথাবার্তাও চলতে থাকে। যেমন 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে একাধিকবার এই জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে পূর্ব থেকে মনে ভাবী ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। যেমন জিতুর দৃষ্টিতে প্রায়ই অচেনা জগৎ ধরা দিত। "...হঠাৎ চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখররাজির ওপর একটা বড় পর্বত, তাদের ঢালুতে ছোট ছোট ঘরবাড়ি।"[৭] এছাড়াও পানীর মৃত্যুর সময় তার দিদিমা এসেছিল। "...এমন সময় তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন জিতু, নির্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাবো...।"[৮] এছাড়াও মেজোবাবুর খোকা হওয়ার পূর্বে এবং তার মায়ের মৃত্যুর পূর্বেই জিতু তা বুঝতে পেরেছিল। আবার তার দাদার মৃত্যুর সময়ও অনেক পূর্বে মৃত ব্যক্তিদের খাটের চারিপাশে দেখা গিয়েছিল। "দাদার খাটের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেলাম। ...দাদার খাটের চারিপাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে।"[৯] বিভূতিভূষণের নিজের জীবনেও এমন ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছিল বলে জানা যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে এই ধরনের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি কি লৌকিক জীবনে সম্ভব? সম্ভব হলে তার দার্শনিক ব্যাখ্যা কী হতে পারে?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিপিনের সংসার' নামক উপন্যাসটিতে একটি স্থানে লিখেছেন— "গরুর গাড়ী ছাড়িল, অনেক খানি রাস্তা... সে কোথায় চলিয়াছে— এই আনন্দ ও বিষাদের আলোছায়া ঘেরা পথে কতদূর-দূরান্তের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা যেন সীমাহীন, লক্ষ্যহীন— সে চলার বিজন পথে না আছে শান্তি না আছে মনোরমা, কেউ নাই...।"[১০] এই স্থানে বিপিনের মধ্য দিয়ে তিনি যে সীমাহীন পথের কথা বলতে চেয়েছেন মনে হয় এমন কোন দূর-দূরান্তের কথা বিভূতিভূষণের প্রায়ই মনে হত। যেমন 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের জিতু প্রায়ই এমন দূর-দুরান্তের পথের সন্ধান পেয়েছে। আবার 'পথের পাঁচালি'র অপুও এমন বহু

দূর পথের সন্ধান পেয়েছিল। এই উপন্যাসে দেখা গেল বিপিনও এমন পথের সন্ধান পেল। তাই মনে হয় এমন বহু দূরের কোন পথের সন্ধান বোধহয় বিভূতিভূষণের নিজের অনুভূতিতেই বারবার ধরা দিত। তিনি হয়ত জীবনকে গভীরভাবে বুঝেছিলেন, তাই বার বার তাঁর রচনার মধ্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী দর্শনের ভাবাদর্শের সঙ্গে অবিরুদ্ধ কি না তা দেখার চেষ্টা করব।

প্রকৃতির কোন কিছুই স্থির নয়, সবকিছুই জীবনাবর্তে চলেছে। এই প্রকৃতির অন্তরালেই কোন আধ্যাত্ম সত্ত্বা নিহিত আছে। যার ফলে আমরা প্রকৃতির লোকান্তরব্যাপী রূপটি প্রত্যক্ষ করি। প্রকৃতির এইরূপ চেতনা থেকেই বিভূতিভূষণের মনে অরূপ চেতনার উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপের অন্তরালে তিনি অতীন্দ্রিয় কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটিতে দেখা যায় নিশ্চিন্দিপুরের নির্জন প্রকৃতি অপুর শিশুমনকে দূরে নিয়ে গিয়েছে এই উপলব্ধি ও চেতনাই হয়ত পরবর্তীকালে অপরাজিত অপুর মধ্যে পরিণত আধ্যাত্ম ও জীবনবোধে রূপান্তরিত হয়েছে। অপু কখনো কখনো জীবনাতীত মহাজীবনের পথ দেখতে পেয়েছে। এইস্থানে তার সঙ্গে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের জিতুর তুলনা করা যেতে পারে। এখানে অপুর শিশুমন তত্ত্ববোধকে ছুঁয়ে গেছে। যেমন বিভূতিভূষণ লিখেছেন— "হঠাৎ একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার ওপর ঝুঁকিয়া পাড়িয়াছে, সে দিকে চাহিয়া দেখিতে তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত— সে সব কথা প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত— "দিদি দিদি দ্যাখ্ দ্যাখ্ ঐ দিকে–" পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, "ঐ যে? ঐ গাছটার পেছনে? কেমন অনেক দূর না? দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখছিলি? দূর তুই একটা পাগল।"[১১] অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে অপু বাস্তবের প্রকৃতি থেকে অনন্তে কোন অরূপের সন্ধানে চলে যাচ্ছে। এই উপন্যাসে আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে— মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে দুর্গার প্রায়ই মনে হত মা-বাবা-ভাই সকলকে ছেড়ে তাকে যেন কোথায় চলে যেতে হবে। সে অনুভব করত তার জীবনে কি একটা অনিবার্য বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে চলেছে। ঠিক যেভাবে পূর্ব থেকে কোন অনুভবের কথা 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে জিতুর জীবনেও উনি বার বার দেখিয়েছেন।

তবে মনে হয় এই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু বলেছেন অপুর পিতার পেশা ছিল কথকতা করে বেড়ানো এবং বাস্তবে তাঁর নিজের পিতাও কথকতা করতেন, তাই প্রায়ই দেখা যায় পুরানো মিথকে তিনি বার বার বাস্তবে স্থান দিয়েছেন। এখান থেকেই মূল্যবোধ, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে ও 'অপরাজিত' উপন্যাসেও সেই কারণেই দেখা যায় রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা অপুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তা তিনি এইভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, 'অপরাজিত' উপন্যাসে দেখা যায়—"আপনা-আপনি পথ চলিতে চলিতে এইসব স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া যায়। কত কথা যেন মনে ওঠে। যত লোকের দুঃখের দুর্দশার কাহিনী। নিশ্চিন্দিপুরের জানলার ধারে বসিয়া বাল্যের সে ছবি দেখা— সেই বিপন্ন কর্ণ, নির্ব্বাসিত সীতা, দরিদ্র বালক অশ্বত্থামা, পরাজিত রাজা দুর্যোধন, পল্লীবালিকা জোয়ান। বুঝাইয়া বলিবার ব্যাখ্যা তাহার এখনও হয় নাই; ভাবকে সে ভাষা দিতে জানে না— অল্পদিনের জীবনে অধীত সমুদয় পদ্য ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া সে যেভাবে জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে— অনাবিল তরুণ মনের তাহা প্রথম কাব্য— তার কাঁটা জীবনে সুখে দুঃখে, আশায়-নিরাশায় গাঁথা বনফুলের হার।— প্রথম উচ্চারিত ঋক্ মন্ত্রের কারণ ছিল যে বিস্ময়, যে আনন্দ— তাহাদেরই স্বগোত্র, তাহাদেরই মত ঋদ্ধিশীল ও অবাচ্য সৌন্দর্যময়।"[১২] 'অপরাজিত' উপন্যাসের অন্য স্থানে লিখেছেন, "বৈকালে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেল... শতাব্দীর ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে, পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া, উল্টাইয়া – পাল্টাইয়া নবযুগের পত্তন করিয়াছে। রাজা শুদ্ধোধনের কপিলাবস্তুও মহাকালের স্রোতের মুখে

ফেনার ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই— কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়েছেন— তাঁহার প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও সে মাথা নত করিবে।"[১৩] তার আরো একটু পরে লিখেছেন, "গাজিয়াবাদ ষ্টেশন হইতে সে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিল— যে দিল্লীতে গাড়ি আসিতেছিল তাহা এস. কপুর. কোম্পানীর দিল্লী নয়, লেজিস্‌লেটিভ য়্যাসেম্‌ব্লীর মেম্বারদের দিল্লী নয়, এসিয়াটিক পেট্রোলিয়মের এজেন্টের দিল্লী নয়— সে দিল্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন — বহুকালের বহুযুগের নরনারীদের মহাভারত হইতে শুরু করিয়া রাজসিংহ ও মাধবীকঙ্কণ, সমুদয় কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পনা ও ইতিহাসের মাল-মসলায় তাহার প্রতি ইটখানা তৈরী, তার প্রতি ধূলিকনা অপুর মনের রোমান্সের সকল নায়ক-নায়িকার পুণ্যপাদপূত— ভীষ্ম হইতে আওরঙ্গজেব ও সদাশিব রাও পর্য্যন্ত— গান্ধারী হইতে জাহানারা পর্য্যন্ত সাধারণ দিল্লী হইতে সে দিল্লীর দূরত্ব অনেক! দিল্লী হনৌজ দূর অস্ত্ বহুদূর বহুশতাব্দীর দূর পারে, সে দিল্লী কখনও কেহ দেখে নাই।

আজ নয়, মনে হয় শৈশবে মায়ের মুখে মহাভারত শোনার দিন হইতে ছিরের পুকুরের ধারের বাঁশবনের ছায়ায় কাঁটা শেওড়ার ডাল পাতিয়া 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাব' পড়িবার দিনগুলি হইতে, সকল ইতিহাস, যাত্রা, থিয়েটার, কত গল্প, কত কবিতা, এই দিল্লী, আগ্রা, সমগ্র রাজপুতানা ও আর্য্যাবর্ত্ত তাহার মনে একটি অতি অপরূপ, অভিনব স্বপ্নময় আসন অধিকার করিয়া আছে— অন্য কাহারও মনে সেরকম আছে কিনা, সেটা প্রশ্ন নয়, তাহার মনে আছে এইটাই বড় কথা।"[১৪]

তিনি লিখেছেন,

> "বৈকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়ার ধারে বসিয়াছে, যখনই অপর্ণার মুখ মনে পড়িয়াছে, কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব মধ্যাহ্নে মায়ের মুখে শোনা মহাভারতের দিনগুলার কথা মনে পড়িয়াছে— তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, "যে জীবন যে জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্ম্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনের একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌম্যজীবন লুকানো আছে— সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন মন্দাকিনী, যার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা...।"[১৫] এইভাবেই এক অসাধারণ দৃষ্টিশক্তির পরিচয় তিনি অপুর মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। মনে হয় এক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী প্রতিভা না থাকলে এমনটা সম্ভব নয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসটিতে যা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয় তা হল এই উপন্যাসে পূর্ব থেকে মনে ভাবী ঘটনার ছায়াপাতের কথা বার বার বলা হয়েছে। তাই এই উপন্যাসটি পাঠ করে একটি প্রশ্ন বেশি করে মনে হয়— একাধিক স্থানে যে জিতুর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটি কি বাস্তবে সম্ভব? উদাহরণস্বরূপ এই উপন্যাসটির একটি স্থানের উল্লেখ করে বলা যায়— "একটা নিস্তব্ধ স্থানে একা গিয়ে বসতাম... দূরে আর একটা অজানা লোকালয়ের বাড়িঘর তাদের লোকজনও দেখেছি।"[১৬] অন্য স্থানে তিনি লিখেছেন, "আমরা ভাইবোন মিলে বাংলোর উঠোনে লাট্টু খেলছিলাম... হঠাৎ চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখর রাজির ওপর একটা বড় পর্বত, তাদের ঢালুতে ছোট বড় ঘর-বাড়ি।"[১৭] এই দুটি অংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জিতুর দৃষ্টিতে মাঝে মাঝেই অচেনা জগৎ এসে ধরা দিত। অন্য এক স্থানে পাই, "আমি রোগীর ঘরে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, কিন্তু পানীয় বিছানায় পানীয় শিয়রে যে বসে আছে তাকে চিনতে পারলাম না।.... এমন সময় তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন জিতু, নির্মলাকে বোলো

পানীকে আমি নিয়ে যাবো, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারব না... সকালে একটু বেলায় রোদ উঠলে পানী মারা গেল।"[১৮] এইখানে দেখা যাচ্ছে জিতু যাকে দেখেছিল সে পানীর দিদিমা। কিন্তু তিনি জীবিত নন। অথচ মৃত্যুর পূর্বে পানীর শিয়রে এসেছিলেন তাকে পরলোকে নিয়ে যাবেন বলে। অর্থাৎ পানীর মৃত্যুর পূর্বদিনেই জিতু পানীর মৃত্যুর পূর্বাভাস পেয়ে গিয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে। আবার একস্থানে লিখেছেন, "হঠাৎ আমার কি হল বলতে পারিনে—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ সভা।"[১৯] এখানেও দেখা যাচ্ছে জিতু তার বোন সীতার বিবাহ ঠিক হয়েছে একথা কিছুমাত্র না জানা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ দূরে, অন্য একস্থানে বসেও হঠাৎ চোখের সামনে তার বোন সীতার বিবাহ সভা দেখতে পেল। অন্যস্থানে লিখেছেন, "আমি একবার মুখ তুলতেই জানলা দিয়ে নজরে পড়ল... কাদের ছোট্ট একটা খোকা... মেজোবাবু বললেন কোথায় তোমার খোকা না কি?"[২০] অন্যত্র তিনি লিখছেন, "এমন সময় একটু তন্দ্রা মত এল। তন্দ্রা ঘোরে মনে হল... রোগীর মুখ আর মায়ের এক।"[২১] অর্থাৎ এই দুটি স্থান থেকে বোঝা যাচ্ছে মেজোবাবুর খোকা হওয়ার পূর্বেই জিতু তার পূর্বাভাস পেয়েছিল এবং অপর স্থানে তার মায়ের অসুস্থতার খবর না জানলেও সে অসুস্থ অবস্থায় তার মাকে দেখতে পেয়েছিল। আবার উপন্যাসের শেষের দিকের একস্থানে দেখা যায় যে তিনি লিখেছেন, "দাদার খাটের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেলাম।... দাদার খাটের চারিপাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে।... শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাঁদিকে কাকীমার মেয়ে পানী এই সময়ে নার্স এল। নার্স কিন্তু এমনভাবে এল যেন আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললে— এত হয়ে গিয়েছে।"[২২] অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে জিতু তার সেই বিশেষ দৃষ্টিশক্তি দ্বারা নার্স আয়ার পূর্বেই বুঝতে পেরেছিল তার দাদার মৃত্যু হয়েছে এবং এমন কিছু আত্মীয় স্বজনদের সে দাদার খাটের চারপাশে দেখতে পেয়েছিল, যাদের পূর্বে মৃত্যু ঘটে গিয়েছে অর্থাৎ তার দাদাকে পরলোকে নিয়ে যেতে এসেছিল। এইভাবে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসটির বিভিন্ন স্থানে জিতুর অতিন্দ্রীয় দৃষ্টিশক্তির পরিচয় লক্ষ্য করেছি।

উল্লেখ্য, এই ধরনের ঘটনা বিভূতিভূষণের নিজের জীবনেও বেশ কয়েকবার ঘটেছিল, হয়ত তাকে তিনি কাহিনির উপজীব্য করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর চোখের সামনে এই ধরনের নানা দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। একবার তিনি দেখেছিলেন তিনি অনেক লোকজনের মধ্যে বসে আছেন, তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁর বক্তব্য শুনে সবাই হাততালি দিচ্ছে। পরবর্তীকালে অনুরূপ ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল। আবার তাঁর ভগ্নীপতি জাহ্নবীদেবীর স্বামী যখন হাসপাতালে ছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পূর্বেই তার খাটের পাশে তিনি মৃত আত্মীয় স্বজনকে দেখতে পেয়েছিলেন। এমনকি শোনা যায় বিভূতিভূষণ তাঁর নিজের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে দেখেছিলেন একটি মৃতদেহ লোকজন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং ঐ মৃতদেহটি স্বয়ং তাঁরই। এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় পূর্ব থেকে তাঁর নিজের মনেও ভাবী ঘটনার ছায়াপাত মাঝে মাঝে ঘটত।

এখানে একটি প্রশ্নই হয় যে পূর্ব থেকে মনে ভাবী ঘটনার ছায়াপাত বা ঐ ধরনের অতিন্দ্রীয় দৃষ্টি কি লৌকিক জীবনে সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে তার দার্শনিক ব্যাখ্যা কিভাবে করা যেতে পারে?

ভারতীয় দর্শনের কয়েকটি স্থানে ঐ ধরনের দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনে ঐধরনের একপ্রকার অসাধারণ জ্ঞান স্বীকার করা হয়েছে যাকে প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়েছে। যদিও ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য ও প্রকার বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে প্রাতিভজ্ঞানকে একপ্রকার মানস প্রত্যক্ষ বলেই স্বীকার করা হয় এবং যথার্থস্থলে তার প্রামাণ্যও স্বীকার করা হয়ে থাকে।

ন্যায়কন্দলীতে শ্রীধর ভট্ট বলেছেন, "ইন্দ্রিয় লিঙ্গদ্যভাবে যদর্থ প্রতিভানং সা প্রতিভা" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও লিঙ্গ (হেতু) প্রভৃতির অভাবসত্ত্বেও যে অর্থের প্রতিভান বা প্রতীতি তাই প্রতিভা, প্রতিভাই প্রাতিভজ্ঞান বলে কথিত হয়।"[২৩]

প্রাতিভজ্ঞানের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রশস্তপাদ বলেছেন, "আম্নায় বিধাতৃ, নামৃষীণমতীতানাগতবর্ত মানম্বতীন্দ্রিয়েযের্ষু ধর্মাদিষু গ্রন্থোপনিবন্ধেষ্পপ্তপনিবন্ধেষু চাত্মমনসৌঃ সংযোগাদ্ ধর্মবিশেষাশ্চ যত্ প্রাতিভং যথার্থনিবেদনং জ্ঞানমুতপদ্যতে তদার্থমিত্যাচজ্ঞাতে তত্তু প্রস্তারেণ দেবর্ষিণাম, কদাচিদেব লোকিকানাম্, যথা কন্যকা ব্রবীতি ইবো মে ভ্রাতাঅগন্তেতি হৃদয়ং মে কথয়তি ইতি।"[২৪] অর্থাৎ আত্মা ও মনের সংযোগ হেতু ধর্মবিশেষ হতে যে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে আর্যজ্ঞান বলে। তা প্রধানতঃ দেবতা ও ঋষিগণের হলেও সাধারণ মানুষেরও কখনো কখনো হয়ে থাকে। যেমন আমার কন্য বলছে, "আমার হৃদয় বলছে যে, কাল আমার ভ্রাতা আসবে।" এখন সত্যিই যদি পরদিন তার ভাই আসে তবে ঐ জ্ঞানকে প্রমাই বলতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি প্রমাণ ব্যতিরেকেও প্রাতিভজ্ঞান স্বীকার করা হয়েছে।

আবার 'ন্যায়মঞ্জরী'তে জয়ন্তভট্ট বলেছেন, "কখনো কখনো অনাগত বিষয়ে আমাদের প্রাতিভজ্ঞানও প্রমা হয়ে থাকে এমন দেখা যায়, যেমন— 'কাল আমার ভ্রাতা আসবে।' এই জ্ঞান অর্থরহিত, সন্দিগ্ধ বা বাধিত নয়, আবার দুষ্টকারণ জন্যও নয়— সুতরাং তাকে প্রমা বলেই স্বীকার করতে হবে। আবার সত্যিই পরদিন ভ্রাতা এলে সেস্থলে কোন বাধকও থাকবে না। এছাড়াও এই ধরনের জ্ঞানকে কাকতালীয়ও বলা যায় না। তাই বোঝা যায় তিনি এই ধরনের জ্ঞানকে প্রমা বলে স্বীকার করেছেন।[২৫]

আবার ইন্দ্রিয় বা লিঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা জনিত নয় এইরূপ প্রাতিভজ্ঞান গৌতম, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত। ন্যায়সূত্রভাষ্যে (৩/২/৩৩) বলা হয়েছে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদি জ্ঞানের করণ ব্যতিরেকেই যে বহির্বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়। যেমন— 'আমার মন বলছে— আমার ভাই আগামীকাল আসবে।' এইরূপ জ্ঞান সফল বা যথার্থ হলেই তাকে প্রত্যক্ষ প্রমা বলা হবে। পুরুষের কর্ম বিশেষকেই প্রাতিভজ্ঞানের হেতু বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তা যুগপৎ সকল প্রাতিভজ্ঞান না জন্মে যথাকালেই জন্মে থাকে।[২৬]

দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ও বৈশেষিকগণ বাধক না থাকলে লৌকিক প্রাতিভজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। আবার ভবিষ্যত অর্থ জ্ঞানকালে না থাকাতে বহিরিন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ সম্ভব না হলেও ঐ অর্থের মানস প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। তাই তাঁরা প্রাতিভজ্ঞানকে অনর্থজ বা অপ্রমা বলেন না। আর এই ধরনের যে দৃষ্টিশক্তি তা শব্দ, লিঙ্গ প্রভৃতি জনিত না হলেও মন-ইন্দ্রিয়জন্য হওয়ায় একে একধরনের মানস প্রত্যক্ষ বলে স্বীকার করেছেন।[২৭]

উল্লেখ্য যে ভর্ত্তৃহরির মতে অনেকসময় বাহ্যার্থ না থাকলেও শব্দ হতেই অর্থস্ফূরণাত্মক প্রতিভা উৎপন্ন হয়ে সকল ব্যবহার উপপন্ন হতে পারে। যেমন— অনেক সময় বাঘ না থাকলেও বাঘ আসছে বললে অনেক বীরের মনে শৌর্য ও ভীরুর মনে ভয়ের উদয় হয়। একে শব্দজন্য প্রাতিভজ্ঞান বলা যেতে পারে। তবে ভর্ত্তৃহরির মত খণ্ডন করে জয়ন্তভট্ট বলেছেন যে এখানে শৌর্য, ভয় প্রভৃতি শব্দজন্য হলেও শব্দের বিষয় বা শব্দার্থ নয়, তা অর্থজন্য। অর্থজন্যই স্ব স্ব চিত্তের সংস্কার অনুযায়ীই বিজাতীয় বৃত্তিবিশেষ মাত্র। তা ইন্দ্রিয়াদির অজন্য বলে প্রাতিভ হলেও শব্দার্থ নয়।[২৮]

যোগদর্শনেও এই ধরনের দৃষ্টিশক্তির উল্লেখ আছে। যোগসূত্র ও যোগবার্ত্তিকের বিভিন্ন স্থানে প্রাতিভজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। নিজের প্রতিভা হতে উৎপন্ন অন্য হতে অলব্ধ অনৌপদেশিক জ্ঞান, যা সর্বজ্ঞানরূপ বিবেকজ জ্ঞানের পূর্বচিহ্ন তাকেই প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়েছে। এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা যোগী অতীত,

অনাগত বিষয় সকলকেও জানতে পারে। এই জ্ঞান আবার যোগীকে সংসার থেকে উত্তীর্ণ করে বলে এ জ্ঞানকে তারকজ্ঞানও বলা হয়। এই প্রাতিভ কোন সংযমের অপেক্ষা না করেই সর্বজ্ঞানের হেতু হয় (যোঃ সূঃ ৩/৩৩), (৩/৩৬)। তাই বিবেকজ জ্ঞানকে মুখ্যত সর্বজ্ঞানের হেতু ও তারক বলা হয়েছে এবং তার পূর্বচিহ্নরূপে প্রাতিভজ্ঞানকে গৌণরূপ তারক বলে অভিহিত করা হয়েছে (যোঃসূঃ ৩/৫২)। অতএব এধরনের জ্ঞান হল সূক্ষ্ম ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট অতীত ও অনাগত পদার্থের জ্ঞান। যোগধর্মানুগৃহীত মনঃ, শোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে সকল অলৌকিক প্রত্যক্ষরূপ বিভূতি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এই দর্শনে লৌকিক প্রাতিভজ্ঞান স্বীকার না করলেও যোগী, ঋষিদের প্রাতিভজ্ঞান স্বীকার করা হয় (যোঃ বার্ত্তিক—৩/৩০)।[২৯]

আবার মীমাংসকগণের মতে প্রাতিভজ্ঞান অদৃষ্টবশঃত উৎপন্ন হলেও তা প্রত্যক্ষ নয়, প্রমাও নয়। শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিলভট্ট যা বলেছেন তার ভাব হল কোন কোন স্থলে প্রাতিভজ্ঞানের বিষয় বাধিত না হলেও অনেকস্থলে বিষয় বাধিত হয় বলে এবং কোন নির্দিষ্ট কারণ হতে উৎপন্ন হয়না বলে প্রাতিভজ্ঞান প্রমা হতে পারে না। এছাড়াও প্রাতিভজ্ঞানের বিষয়ভাবী সুতরাং অবর্তমান বলে তার মানসপ্রত্যক্ষও হতে পারে না। যোগীগণেরও ধর্মবিশেষের দ্বারা ব্যবহিত, দূরস্থ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রাতিভজ্ঞান উৎপন্ন হলেও তা প্রত্যক্ষ হতে পারে না। (শ্লোকবার্ত্তিক ৪/২৫, ৩২) সাংখ্যমতেও প্রাতিভজ্ঞানকে স্বীকার করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতেও লৌকিক প্রাতিভজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করা না হলেও যোগী প্রত্যক্ষরূপ প্রাতিভজ্ঞানের এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রাতিভজ্ঞানের প্রামাণ্য তাঁরা স্বীকার করেন। ('অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' ৩/২/২৪ ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য ১৩১-১৩২) আবার বেদান্তিগণ যে সাক্ষীপ্রত্যক্ষের কথা বলে তাও একপ্রকারের প্রাতিভজ্ঞান। তবে বাচস্পতিমিশ্র সাধারণ লৌকিক প্রাতিভজ্ঞানের এমনকি নিরন্তর ভাবনার ফলস্বরূপ দেবতাদি সাক্ষাৎকারের প্রামাণ্যও স্বীকার করেননি। তাঁর মতে সে সব বিষয়বস্তুর অধীন বা অনুরূপ নয়। (ভামতী ৩০-৫৪)[৩০]

এইভাবেই দেখা যাচ্ছে দর্শনেও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে কোন কোন মতে তা শুধুমাত্র যোগী বা ঋষিগণের সম্ভব বলে মনে করা হলেও কোন কোন মতে লৌকিকগণেরও এমন দৃষ্টিশক্তি সম্ভব হতে পারে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমন ধরনের দৃষ্টিশক্তির কথা বলেছেন, এমনকি তাঁর নিজের জীবনেও বিভিন্ন সময়ে এমন দৃষ্টিশক্তি লক্ষ্য করা গিয়েছে তার ব্যাখ্যা দর্শনের লৌকিকগণের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির ব্যাখ্যার মতন মনে করা যেতে পারে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রচনার মধ্যে পুর্বানুমানের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— মৃত্যু বিষয়ে পূর্বানুমানের কথা 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটিতে লক্ষ্য করা যায়। সেখানে দেখা যায় দুর্গা তার অকালমৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে নিতম পিসীর কথা অনুভব করত, তার মনে হত তার আদরের ভাই, বাবা, মাকে ছেড়ে কোথায় কতদূরে চলে যেতে হবে। তিনি লিখেছেন— "আসন্ন বিরহের কোন বিস্বাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পেছনের বাঁশবন, ছায়া-ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু, তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে একবেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু হু করে— তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূরে যাইবে। আর সে যদি না ফেরে— যদি নিতম পিসির মত হয়?"[৩১]

টমাস হার্ডিরও 'টেস্ অফ্ দি ডারবারভিল্স' উপন্যাসে মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বানুমানের ঘটনা টেস্-এর চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। টেস্ তার প্রেমিক ও স্বামী এঞ্জেলের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পুনরায় তার সাথে মিলিত হয়েছে। কিন্তু জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত ও অবসন্ন টেস্ এতদিন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা

করে বসেছিল। টেস্ যেন আসন্ন অকাল মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে প্রত্যাসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে টেস্-এর পূর্বানুমান প্রকাশিত হয়েছে। সেখান্ত তিনি লিখেছেন—

> "My life can only be a question of a few weeks… Angel, if anything happens to me, will you watch over Liza-Lu for my sake?... and if she were to become yours, it would almost seem as if death had not divided us."[৩২]

অর্থাৎ এইস্থানে দুর্গা এবং টেস্-এর মৃত্যু সম্বন্ধে পুর্বানুমানের কল্পনাতে সাদৃশ্য রয়েছে। টমাস হার্ডির "দি মেয়র অফ্ ক্যাষ্টর ব্রিজ' উপন্যাসে হেনচার্ড, সুসান, 'দি উড্ ল্যাণ্ডারস্'-এ গাইলস্, 'জুড দি অবস্কিওর'-এ জুড এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে হরিহর, সর্বজয়া, 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এ জিতুর বাবা, দাদা যেন পুর্ব থেকেই মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। অতএব এই ব্যাপারে তাঁদের দুজনের রচনায় কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে দেখিয়েছেন জিতু মাঝে মাঝে এমন সব দৃশ্য বা বস্তু দেখতে পেত যা অপরের দৃষ্টিতে ধরা পড়ত না। যেমন জিতু বলেছে, "আমি আজকাল নির্জনে বসলেই অদ্ভূত সব জিনিস দেখি যখন-তখন, তার সময় নেই, অসময় নেই, রাত নেই। এইতো সেদিন বসে আছে জ্যাঠামশাইদের পুকুরের ধারে বাগানে একলাটি— হঠাৎ দেখি, পুকুরপাড়ের আমগাছগুলোর ওপরকার নীল আকাশে একটা মন্দিরের চুড়ো।... আর একদিন দেখেছিলাম ঠিক ওই জায়গায় বসেই আকাশ বেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনটি সুন্দরী মেয়ে, পরণে যেন শ্বেত চমরীর লোমে বোনা সাদা চক্‌চকে লুটিয়ে পড়া কাপড়— তারা উড়ে যাচ্ছে এক সারিতে বোধ হয় পুরো পাঁচ মিনিট ধরে তাদের দেখেচি।"[৩৩] জিতুর ধারণা ছিল সবাই বোধহয় স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তারই মত ঐসব বস্তু ও দৃশ্য অবলোকন করতো, কিন্তু তার মাকে জিজ্ঞাসা করে তার ঐ ভুল ভেঙেছে। একস্থানে তিনি লিখেছেন, "আগে আগে আমার মনে হত, আমি যেমন দেখি সবাই বোধহয় ওরকম দেখে। কিন্তু সেবার আমার ভুল ভেঙে যায়। আমি একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা মা পাহাড়ের ওদিকে আকাশের গায়ে ও সব কি দেখা যায়? মা বললেন কোথায় রে?"[৩৪] অপরদিকে হার্ডির 'টেস্ অফ ডারবারভিলস্' উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় টেস্ মাঝে মাঝে এমন দৃশ্য দেখতে পেত, যা অন্য কারো দৃষ্টিগোচর হত না। এই উপন্যাসে তিনি লিখেছেন,

> "But this encompassment of her own characterization based on shreds of convention, peopled by phantoms and voices, antipathetic to her, was a sorry and mistaken creation of Tess's fancy – a cloud of moral hobgoblins by which she was terrified without reason. It was they that were our ot harmony with the actual world, not she."[৩৫]

এইভাবেই এই বিষয়ে টমাস হার্ডি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও মানস প্রবণতার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এইভাবেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির পরিচয় লাভ করি। তাঁর জীবনে এই ধরনের দৃষ্টিশক্তি বার বার লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভারতীয় দর্শনেও এই ধরনের দৃষ্টিশক্তির পরিচয় বেশ কয়েকটি স্থানে লক্ষ্য করা যায়, যা এই প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখলাম। এছাড়াও এই ধরনের দৃষ্টিশক্তির পরিচয় ইংরেজ লেখক টমাস হার্ডির রচনার কোনো কোনো স্থানে লক্ষ্য করা যায়, তাও প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধে আলোচনা করলাম।

তথ্যসুত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। তৃণাঙ্কুর, (দিনলিপি), পৃ. ৪৩৩।
২. ঐ, প্রথম খণ্ড, স্মৃতির রেখা (দিনলিপি), পৃ. ৪০৩।
৩. ঐ, পৃ. ৪০৯।
৪. ঐ, পৃ. ৪১৯।
৫. ঐ, পৃ. ৪২২।
৬. ঐ, সপ্তম খণ্ড, নবাগত মুক্তি, পৃ. ২২৭-২২৮।
৭. ঐ, চতুর্থ খণ্ড, দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃ. ১৮।
৮. ঐ, পৃ. ৫৬।
৯. ঐ, পৃ. ১৪৮।
১০. ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, বিপিনের সংসার, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।
১১. ঐ, প্রথম খণ্ড পথের পাঁচালী, পৃ. ৭৮।
১২. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, অপরাজিত, পৃ. ৪৪।
১৩. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, অপরাজিত, পৃ. ৬৯-৭০।
১৪. ঐ, পৃ. ৭১।
১৫. ঐ, পৃ. ৮৬।
১৬. ঐ, চতুর্থ খণ্ড, দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃ. ১৭।
১৭. ঐ, পৃ. ১৮।
১৮. ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭।
১৯. ঐ, পৃ. ৯১।
২০. ঐ, পৃ. ৮৫।
২১. ঐ, চতুর্থ খণ্ড, দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃ. ৯৯।
২২. ঐ, পৃ. ১৪৮-১৪৯।
২৩. প্রশস্তপাদাচার্য প্রণীত, প্রশস্তপাদভাষ্যম্ (পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ), পৃ. ৬২৮।
২৪. দ্রষ্টব্য: ঐ, পৃ. ৬২৩।
২৫. দ্রষ্টব্য: জয়ন্ত ভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯।
২৬. দ্রষ্টব্য: গৌতম, ন্যায়দর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২০।
২৭. দ্রষ্টব্য: জয়ন্ত ভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯।
২৮. দ্রষ্টব্য: ঐ, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬।
২৯. দ্রষ্টব্য: শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য– ভারতীয় দর্শন কোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১।
৩০. দ্রষ্টব্য: শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য– প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা, পৃ. ৮০-৮৩।
৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী। প্রথম খণ্ড, পথের পাঁচালী, পৃ. ১২১।
৩২. Thomas Hardy– Tess of The D'urburvills, pp. 413-415.
৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী। চতুর্থ খণ্ড, দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃ. ৪৮।
৩৪. ঐ, পৃ. ১৫।
৩৫. Thomas Hardy – Tess of The D'urburvills, p. 101.

গ্রন্থতালিকা:

1. গৌতম, ন্যায়দর্শন (তৃতীয় খণ্ড), মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, প্রকাশক– পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা–১৩, দ্বিতীয় প্রকাশ–১৯৮৪।
2. জয়ন্তভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী, সম্পাদনায় সূর্যনারায়ণ শুক্লা, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী–১ (ভারত), ১৯৭১।
3. প্রশান্তপাদাচার্য প্রণীত, প্রশস্তপাদভাষ্যম্ (পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ)। শ্রীধর ভট্ট ন্যায়কন্দলী ব্যাখ্যাসহ, সম্পাদক–পণ্ডিত শ্রী দুর্গাধর ঝাঁ, প্রকাশক–সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৯৭।
4. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়– বিভূতি রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮১।
5. ঐ, (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭।
6. ঐ, (৩য় খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭৯।
7. ঐ, (৪র্থ খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৯।
8. ঐ, (ষষ্ঠ খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৯।
9. ঐ, (সপ্তম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮২।
10. শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য–ভারতীয় দর্শন দোষ (সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন) (২য় খণ্ড), সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা-১৯৭৯।
11. শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী–প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা – ১৭৯৩।
12. Thomas Hardey– Tess of The D'urbervills, The New American Library, New York, 1980.